পাঠকের চিঠি

আবাদভূমি রক্ষার লড়াই : ভারতের মণিপুরবাসীর সংগ্রাম

২০১৫ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকটিতে মণিপুরের ইম্ফল এলাকায় চলল টানা গণ-আন্দোলন। গণ-আন্দোলনের প্রত্যুত্তরে ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র মণিপুর বা কাশ্মীর গোছের এলাকায় যা করতে অভ্যস্ত, তা-ই করল। অর্থাৎ কারফিউ জারি করল, নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের সশস্ত্র রাষ্ট্রশক্তি বেধড়ক মার দিল দিনের পর দিন, একজন তরুণ আন্দোলনকারী, যার নাম রবিনহুড, তাকে গুলি করে পুলিশ হত্যাও করল। মণিপুরের এই আন্দোলনের একদম সামনের সারিতে রয়েছে হাজার হাজার রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন স্কুল ছাত্র-ছাত্রী। তারা পুলিশের মার খেয়েও নিজেদের জাতির ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার দাবি, অর্থাৎ 'ইনার লাইন পারমিট' (আইএলপি) প্রচলনের দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। যখন 'ইন্ডিয়া'র 'কুল ও ট্রেন্ডি' টিন এজাররা তাদের 'অ্যাসপিরেশনাল' মা-বাবার সুশিক্ষায় 'পার্সোনাল স্পেস', 'টিম ইন্ডিয়া' এবং মল-মাল্টিপ্লেক্সে বিভোর থেকে তাদের সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছে, ঠিক তখনই তাদের মণিপুরি ভাই-বোনেরা জানান দিচ্ছে যে তারা অন্য ধাতু দিয়ে গড়া।

মণিপুরি কিশোর-সমাজের এই রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ক ও বিস্ফোরক আন্দোলন নিয়ে আমাদের কিছুই আসে-যায় না, কারণ– এক, মণিপুরে যে কিছু ঘটছে, সেটাই আমাদের ভাবনার মধ্যে নেই; দুই, 'ইনার লাইন পারমিট' জিনিসটি কী তা আমরা জানি না; তিন, এতে ভারতীয়ত্বের কোনো নামগন্ধ নেই, তেরঙা দ্বিচারিতাও নেই, মোমবাতি নেই, সেলফি তোলার সুযোগ নেই। অতএব, আমরা এতে নেই। তবু একটু খোঁজ নেওয়াই যাক না, কেসটা কী। কারণ স্কুলছাত্র রবিনহুডকে খুন করা হলো যে 'আইন রক্ষা'র নামে, সে আইন তো আমার-আপনার সম্মতিতে তৈরি বলেই বৈধতা দাবি করে।

'ইনার লাইন পারমিট' বা আইএলপি হলো অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড (ডিমাপুর বাদে) ও মিজোরামে ঢোকার জন্য এসব এলাকার বাইরের ভারতীয় নাগরিকদের জন্য আবশ্যিক একটি সরকারি ছাড়পত্র। এই আন্দোলন মণিপুরেও আইএলপি প্রবর্তনের দাবিতে, যার নেতৃত্বে রয়েছে জয়েন্ট কমিটি অন আইএলপি সিস্টেম নামক দল-নিরপেক্ষ নাগরিক-রাজনৈতিক জোট। আজকে যে অঞ্চল 'উত্তর-পূর্ব' নামে পরিচিত, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ফিরিঙ্গিরা এই এলাকার স্বাধীন রাজ্যগুলো দখল করছিল এবং তাদের তৈরি ইন্ডিয়ার মধ্যে সেগুলো জুড়ে দিচ্ছিল নানা অসৎ অছিলায়। যেহেতু এই এলাকায় স্বাধীন অসমকে দখল করে সেখানে চা-সমেত নানা ব্যবসা শুরু করল ফিরিঙ্গিরা, তাদের এই ধান্দাকে সুরক্ষিত করতে তারা আনল আইএলপি। এর ফলে অসমকে ঘিরে থাকা এলাকার (অর্থাৎ আজকের অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড ও মিজোরাম) মধ্যে বাইরের কেউ শুধু অনুমতি সাপেক্ষে ঢুকতে পারত। ওই এলাকার মানুষজন মোটামুটি স্বায়ত্তশাসনই চালাত (যা ছিল বাংলা বা বিহারের মতো সোজাসুজিভাবে ফিরিঙ্গিশাসিত এলাকায় কল্পনাতীত), দিল্লি বা লন্ডনের নাক গলানো ছিল নগণ্য। বদলে ওই এলাকার রাজ্য তথা জনগোষ্ঠীগুলোও অসমে ঢুকে পড়ত না এবং ফিরিঙ্গি সরকারের জন্য নিরাপত্তা খাতে খরচা ও মাথাব্যথা কমে গেছিল। এর ফলে অসমে অর্থনৈতিক মুনাফা প্রকল্পে ফিরিঙ্গিরা সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পেরেছিল। এই এলাকাগুলোর 'স্বরাজ' অবলুপ্ত হলো ১৯৪৭-এ দিল্লিরাজ শুরু হবার পর থেকে। ১৯৪৯-এ মণিপুরের অনির্বাচিত মহারাজাকে শিলংয়ে গৃহবন্দি করে, ভারতীয় বাহিনীর কুচকাওয়াজের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করিয়ে ভারতের মধ্যে মণিপুরকে জুড়ে দেবার চুক্তিপত্রে একপ্রকার তার পূর্ণ সম্মতি ছাড়াই সই আদায় করা হয়। অথচ এই সময়ে মণিপুরে জনগণের দ্বারা অবাধ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একটি সার্বভৌম সরকার বর্তমান ছিল, যারা সম্পূর্ণভাবে মণিপুরের আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল। সেই নির্বাচনে ভারতপন্থী কংগ্রেসিরা লড়েছিল, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। প্রজা শান্তি দলের নেতৃত্বে, কংগ্রেসকে পর্যদুস্ত করে গড়ে উঠেছিল সেই মণিপুর সরকার–মহারাজা ছিলেন স্রেফ আনুষ্ঠানিক প্রধান। যেহেতু নেহরুর ভারত ছিল প্রবলভাবে 'গণতান্ত্রিক', তাই তারা মণিপুরকে জুড়ে নেবার সাথেই সাথেই মণিপুরবাসীদের নির্বাচিত নিজস্ব সরকারকে বরখাস্ত করে দেয়! আফস্পার মাধ্যমে মিলিটারি শাসনের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা এই নয়া গণতন্ত্র এগিয়ে চলেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে, 'এনকাউন্টার' খুনের নিরালা পরিবেশে খাকি উর্দির কঠিন নজরদারিতে।

মণিপুরে আগে থেকে আইএলপি নেই, কারণ এই রাজ্য কখনো ফিরিঙ্গি শাসনাধীন ছিল না। যে সময়ে ফিরিঙ্গিরা এই এলাকায় তাদের দখলদারি ও শাসন বাড়িয়ে তুলছিল, মণিপুরের সার্বভৌম মহারাজারা ছলে-বলে-কৌশলে ফিরিঙ্গিদের 'ইন্ডিয়া' উপনিবেশ থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখতে পেরেছিল, পেরেছিল নিজেদের বহু-শতাব্দীর রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য। মণিপুরিদের নিজভূমে বাইরের কে প্রবেশ করবে না করবে, এটা ঠিক করার প্রায় নিরঙ্কুশ অধিকারও ছিল মণিপুরিদের। ফলে মণিপুরের জনগোষ্ঠীগুলোর ক্ষমতাগত ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বগুলোও মুছে যায়নি। কিন্তু ১৯৪৯-এ ইন্ডিয়াতে জুড়ে যাওয়ার ফলে মণিপুরিদের এই বাইরের লোকের ঢোকাকে নিয়ন্ত্রণ করার স্বাধিকার আর রইল না। তাই এই আইএলপি প্রবর্তনের দাবির মূলে আছে মণিপুরের নিজস্ব জনগোষ্ঠীগুলোর নিজেদের পারম্পরিক আবাদভূমি তথা জন্মভূমিকে নিজেদের জন্য রক্ষা করার স্বাভাবিক বাসনা। তার কারণ, ইন্ডিয়ার মধ্যে বিলয়ের ফলে বাইরে থেকে আসা বিশালসংখ্যক মানুষের ভিড়ে নিজভূমে পরবাসী হয়ে যাবার আশঙ্কাটা একদমই অমূলক নয়। উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা মণিপুরের চেয়ে ৭৫ গুণ বেশি। ইতিমধ্যেই ইম্ফল উপত্যকায় মণিপুরি ও বহিরাগতের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু 'কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আমরা সকলে ভারতীয়'–এই বহুল প্রচারিত স্লোগানটা কি সত্য নয়? আমরা সকলে এক জাতীয় হই বা না হই, যেটা একদম নিশ্চিত সেটা হলো আমরা সকলে একই রাষ্ট্রে সহনাগরিক। নয়াদিল্লির কিশোর-যুবসমাজের যেমন নিরাপদভাবে নির্ভয়ে জীবন কাটানোর স্বাধীনতা আছে, মণিপুরি কিশোর-যুবসমাজের একই রকম স্বাধীনতা নেই। কেন তাদের সে স্বাধীনতা নেই তা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে কিছু অপ্রিয় সত্য প্রকাশ অনিবার্য হয়ে উঠবে। ওদিকে না যাওয়াই ভালো। পাঠকদের শুধু এটা লক্ষ করতে বলি যে দেখবেন ভারতের 'জাতীয়' মিডিয়া দিল্লিতে মণিপুরি যুবদের ওপর হয়রানির ঘটনা নিয়ে যতটা প্রচার করে, আসল মণিপুরের মণিপুরি যুবসমাজের জীবনের দৈনিক ত্রাস ও লাঞ্ছনাকে নিয়ে তার সিকিভাগও করে না। করা সম্ভব নয়; দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

সাম্প্রতিক অতীতেও নিজভূম নিয়ে ব্যাপক অর্থে স্বতন্ত্র ছিল এমন জাতিগোষ্ঠীর পক্ষে হঠাৎ করে কোনো বৃহত্তর ব্যবস্থার মধ্যে 'ক্ষুদ্র' স্থান পাওয়া বা নিজভূমে সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়াকে খুব সহজভাবে নেওয়া সম্ভব নয়। এমনটাই স্বাভাবিক। ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে নানা জাতীয়তার মধ্যে বহিরাগত জনস্রোতের ফলে নিজভূমে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার বাস্তব উদ্বেগকে ভারতের সংবিধান সাধারণত কোনো স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু তাই বলে উদ্বেগগুলো উবে যায় না, বিশেষত যখন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী অবধি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থা, কাজের সুযোগ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইত্যাদি বিশাল তারতম্য আছে। অনগামী জাফু ফিজো, প্রবাদপ্রতিম নাগা জননেতা, ১৯৫১-তে বৃহৎ জনসংখ্যার রাষ্ট্র ভারতের মধ্যে নাগাদের নিজস্ব আবাদভূমির সঙ্কুচিত অবস্থার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, *'আমরা খুব সহজেই ডুবে যেতে পারি, হারিয়ে যেতে পারি : আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সভ্যতা, আমাদের প্রতিষ্ঠান, আমাদের দেশ এবং আমাদের সংগ্রামে আজ অবধি গড়ে তোলা যা যা আছে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাতে মানবসমাজের সামান্যতম উপকারও হবে না।'* কেউ নিজেদের পারস্পরিক আবাদভূমিতে প্রান্তিক হয়ে উঠতে চায় না। আজ বৃহৎ জাতীয়তার সামনে ক্ষুদ্র জাতীয়তার ক্রমশ বিলীন হয়ে যাবার সংকটময় সময়ে হয়তো কোথাও ফিজোর ঘোষণায় নিহিত বহুত্ববাদী ধারণা, অর্থাৎ সকল জাতীয়তার ও জাতিগোষ্ঠীর নিজ এলাকায় নিজেদের মতো বাঁচার অধিকার নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা করার দরকার আছে। বাংলায় বা তামিলনাড়ুতে কি যথাক্রমে বাঙালিরা বা তামিলরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবার কথা কল্পনায়ও আনতে পারে? তা কি কখনো মঙ্গলময় হতে পারে? এমন যদি কখনো ঘটে, তার প্রতিক্রিয়ায় কী ধরনের শক্তির উন্মেষ ঘটবে, আমাদের কোনো ধারণা আছে? কোনো জাতিকে এমনভাবে কোণঠাসা করা অনুচিত। তাই মণিপুরে আইএলপি দাবি এক ন্যায্য দাবি।

গর্গ চট্টোপাধ্যায়: ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের সহকারি অধ্যাপক।
ইমেইল: drgarga2@gmail.com